সমূহ ।

গদ্যগ্রন্থাবলী, ১১শ ভাগ

সমূহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ৷৷০

প্রকাশক

কলিকাতা—দি ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

৭৩৷১ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ 'কান্তিক প্রেসে'

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

সমূহ।

স্বদেশী সমাজ।

(বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।)

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণু-কুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করি-তেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্ত-প্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করি-বার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎ-সবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকার বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকারবাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশকুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিকভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে

বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না তাহা নহে।—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে;—বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেম্‌নি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড় বড় কর্ত্তব্য-ভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়,

তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এসমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত —এইজন্য ইংরাজ ষ্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্ণমেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না, তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ, এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য!

আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এপর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচার বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই-আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের

চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লি হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি একথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক, বিদ্যা ও ধনমান অর্জ্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালীজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালীর সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টা-পাল্টা হইয়া না যায়! বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

ইহাতে আমাদের নানা কাজে যে কিরূপ অসঙ্গতি ঘটিতেছে প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্স্ই তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কন্ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরাজিশিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর-সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল্ সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল্ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্য্যকলাপে যে সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে কর, প্রোভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতিধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক্-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশে প্রধানত পল্লিবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎজগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেম্‌নি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে,

তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হাললাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নহে, যেখানে নানস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলা গুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,—কোনোপ্রকার নিস্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতিসম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানাস্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন; তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা, রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ্, ম্যাজিক্লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ

আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থাদ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্য্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশেব হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্য-রস ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি-ব্যাপাবে যাহা-কিছু আমোদ আহ্লাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সে স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং "সাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রাম সকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার মনকে সবস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণলোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলাসম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলায় পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড় বড় জলাশয় আমাদিগকে জলদান, স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে, তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে

রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেম্‌নি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে, তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইব।

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কি উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র—এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া, কি করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের সর্ব্বপ্রধান মঙ্গল ব্যাপার বলিয়া গণ্যই করেন না তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে "পেসিমিষ্ট্‌" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভ-দ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্‌" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই

হোক্, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষ-ভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনঃই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্পর্ক রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাবৃন্দ সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এই জন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য্যসাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিক্ই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য।

জাপানযুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিষ, সন্দেহ নাই—সৈন্যদিগকে কলের মত হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—সেই সম্বন্ধের নিকট

তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চ-খেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না—মানুষের মত হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্ম্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট্ আত্মহত্যার মত হইয়া দাঁড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—"ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে!" জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক্, এইরূপ আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ;—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনোপ্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্য্যন্ত টানিয়া-লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন্। আমি রাজশাহী ও ঢাকার প্রোভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্‌ফারেন্স্ ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিষ বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীদল গিয়াছি—আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্য দাবী ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বান-কর্ত্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ,

আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেড্-সোডাওয়াটার গাড়ি-ঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন—তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ঙ্কর কেজো হইয়া উঠি না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই,—আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স্ তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে, আত্মীয়ভাবে সংবর্দ্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কি-পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পূরা কাজ করে—যে অংশ কেজো, তিনদিনমাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ-পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান হইত—এখন বহুদিন হইতে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কন্‌গ্রেস্-কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে

খুব যখন বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি—সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটু-খানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাঙিয়া, বাঁটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কি করা হইতেছে, তাহা তিনি ভাল বুঝিতেই পারেন না। মা'র মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিত—যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়—আহূত-অনাহূত আপামরসাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত—কিন্তু আনন্দে-মঙ্গলে ও মাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক্, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জল-দান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধ-কার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্রসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি,

পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই—এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ,—সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম্মগুলিকে পরের হাতে বিদায়দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য পঞ্চাশহাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশের জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কি হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে, দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে?

এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশ-হিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রশ্রয় পাইবে না—কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে। আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই—তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জ্জিত অন্নও বহুদূর-কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মত না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে—কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম্ম! এইবার সময় আসিয়াছে,—যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে,—যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ কর, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কি করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনার কর্ত্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টা-গুলিকে নির্দ্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি প্রথম উৎসাহের

ধাক্কায় তাহা যদি-বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা—সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভাল, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃত উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত-অভাব-মোচন, মঙ্গলকর্ম্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড় বড় মঠ মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে-জলে-স্বাস্থ্যে-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সাম্‌নে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্ত্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম একস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হোক্, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে সমস্ত

অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভাল—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ়-সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জ্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্চ্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মত আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিবোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজেব কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে হয়।

নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূলব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে নূতনকালের সহিত

আপনার পুরাতনের আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি!

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্য্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান্ বা আমেরিকগণের মত উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য উপনিবেশ হইত বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচার-বিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনেব অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এশিয়াব্যাপী ধর্ম্মপ্লাবনের সময় নানাজাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়া-ছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্ব্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডনসঙ্কুল এই হিন্দুধর্ম্মের, এই হিন্দুসমা-

সেই ঐক্যটা কোন্‌খানে ? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিঁদুসমাজ নানা পরস্পর-অসঙ্গত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়-ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্য-সাধনের প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানসমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবিরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা-স্থানে ধর্ম্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন ত দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান,—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-

প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্য্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তনমাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয় —তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারত-বর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারত-বর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত, সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্র-যাত্রা আমরা সকল দিক্ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের—দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধি-

পত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণ প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া-উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ্ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে!

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্রূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পাবে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকাব, ধর্ম্মের অধিকাব, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজেব যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচাব পালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য্যবিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া-আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকে'ও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্ব-মানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্-মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভার-স্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটুলি পাঁট্‌লা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেম্‌নি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্বত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা

প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যারদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হৌক্, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে,—লজ্জা দূর হইবে,—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মত গ্রহণ করিব, তাহা নহে,—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। ঐক্যসাধনই ভারত-বর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে,—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্ একের মধ্যে সকলকেই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—মদোদ্ধত ধনীর শিক্ষাশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর! আমরা কি এই জননীর জীর্ণগৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ীর বিল্ চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা-আসবাব্-আড়ম্বরে কম্‌তি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন, পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারি অন্নের

ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত,—একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া ত কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, এক্‌লা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমবা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—কখনই নহে! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে, নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদেব দুই-চারিদিনের এই ইস্কুলেব মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে;—এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্‌!"

১৩১১

"স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল, অর্জ্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনি তিনি সামান্য দস্যুব হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজেব বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্ব্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ কবিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মবক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুবোপের শক্তিব ভাণ্ডাব ষ্টেট্ অর্থাৎ সবকার। সেই ষ্টেট্ দেশেব সমস্ত হিতকর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—ষ্টেট্ই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেট্ই বিদ্যাদান কবে, ধর্ম্মরক্ষার ভারও ষ্টেটেব উপব। অতএব এই ষ্টেটেব শাসনকে সর্ব্বপ্রকাবে সবল, কর্ম্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া বাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্ম্মরূপে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্ম্মকে, সমাজকে বাঁচানোই ভাবতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্ম্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপ্‌রিপাওনার মত লইতেছে—"ফাউ" বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখ। ইংরাজের আইন আমাদের সমাজ-রক্ষার ভার লইয়াছে। হয় ত যথার্থ ভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুসি থাকিলে চলিবে না। পূর্ব্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত, তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক্ হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত, সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তিসম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্‌পন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক্ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু, তাহা স্থির করিবার

ভার লইয়াছে—রক্ষা করিবার ভার ইংরাজের হাতে নাই; সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক্ হওয়ার দরুণ কাহারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরাজরচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারো কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেলদাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে, তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে, তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভাল নহে,—বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জ্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে। বরং এই বর্জ্জন করিবার জন্য ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে, সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোট করিতেছে, তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলি খোয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া, আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারো অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিস্‌ম্যান্ ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃষ্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মত ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমনভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব—অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্ব্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানানির্ণয়সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তৃত্বপ্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে, তাহাই হইতেছে; —যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে, তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে, আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখনি ডাক্তার ভয়

পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে—সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্ম সমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া?

এইরূপে বিদেশীশিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেহ বিচার করে না যে,—কেন এমনটা ঘটিতেছে?

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দ্দিকাশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিষই ভাল, অস্থানে পতিত ভাল জিনিষও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ৎ।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ-সক্রিয় থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞানদর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা

কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্ব্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়!

যাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট-নিষ্ক্রিয়, সেই সময়ে একটা সচেষ্ট-শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায় তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন?

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া-বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্ব্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব, তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমরা বলিয়া থাকি, সমাজ ত আছেই, সে ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা বর্ত্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্ত্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে—পূর্ব্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে, তাহা নহে। অতীত-বর্ত্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্বলিত, অপরাংশ নির্ব্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে ত সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল—জীবনের সহিত মৃত্যুর কি সম্পর্ক?

কেবলমাত্র অলসভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরাজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে,

সবই ভাল, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে—তাহাতে আসল ইংরাজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ, ইংরাজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে। ইংরাজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড় হইয়াছে—পরের-গড়া জিনিষ অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহাবা ইংরাজ হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ইংরাজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরাজত্ব আমাদেব পক্ষে দুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড় হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহাবা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেই জন্যই তাঁহারা বড় হইতে পারিয়াছেন। আমাদেব চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের সহিত আমাদের জড়সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আব ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনেব যোগ আছে—তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ কবে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদেব মনে যদি তাহার কোন নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের-দাড়ি-পরা যাত্রার নাবদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য্য। আমরা একটা বড় রকমের যাত্রাব দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্ব্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্ব্বপুরুষদের সেই চিত্তকে আমাদের জড়-সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে, তবেই আমরা বড় হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ-স্মৃতি ও বৃহৎভাবের দ্বারা আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া উঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া

আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।

জীবনের পরিবর্ত্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া, সে পরিবর্ত্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সজীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অনুকূল করিয়া আনে—আর নির্জ্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যচেষ্টা নাই—বাহির হইতে পরিবর্ত্তন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নূতন অবস্থা, নূতন শিক্ষা, নূতন জাতির সহিত সংঘর্ষ—ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমন ভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের বন্যা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্ত্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্ব্বপুরুষের দোহাই মানিলেও পূর্ব্বপুরুষ সাড়া দিবেন না।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী-সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে, সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে, প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কি করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেম্‌নি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মৎলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন মৎলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মৎলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করে, এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ ষ্টীম্‌রোলার্‌ বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে

আপন করা যে একাকার নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি—আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই অমনি হাঁহাঃশব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে—ইহার রক্ষাদেবতা,—যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া-আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে, অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন,—তিনি কখন্ ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন, তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রাকথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সেস্থলে "নূতন" কথাটার তাৎপর্য্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন?

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্য-প্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয়কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো একটি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা, সাধু, পিতা, গুরু, ভাই, ভৃত্যের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা

শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে, ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না; যদি করি, তবে হিন্দুধর্ম্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না?

এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম্ম বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোন উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন্ কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দুচারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরীকে ডাকিয়া বলি—"ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সামলাও" তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ রচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে? তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুসি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে আমাতে হয় ত চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধুইয়া ফেল, তোমার মণিমাণিকের পসরা সাম্‌লাও—দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড় অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

১৩১১

দেশনায়ক।

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে, তবে তখনি ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ-মৃত্যু। তেম্‌নি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোট-বড় বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে একএকটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে,—যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্ম্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দির-ভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মত এমন কঠোর সত্য,—এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কি আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কি, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া

বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণ-কঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাঁটি সোনা নহে। যাহা খাঁটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংবেজজাত যে এ সম্বন্ধে জহরী, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কি করিয়া? আনাদের দেশহিতৈষণার উদ্যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করিবে কি উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবী করিতে পারি। কিন্তু সত্য কবিয়া বলুন, কে আমরা কি করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদেব মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদেব অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্ত্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবাব চর্চ্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূব—হয় বিধাতা, নয় গবর্মেণ্ট,করিবেন,এই ধারণাকেই আমরা সর্ব্ব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমবা যে দলবদ্ধ,—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারি, একথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশেব লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশেব দুঃখেব সঙ্গে আমাদেব চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তিব উপবে প্রতিষ্ঠিত হয় না—সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারো সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক্ কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে—

কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো—

আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।
পরের পায়ে ধরে' মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণ আগে কর দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহ বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া ত হাত খোলসা করিয়াছি, আজ ত আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি ত ভালই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবী রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মত বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই

কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে কেন। আমরা কেন মনে করি, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর, এ কথা জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কেবল কি আমরাই—এই দুরত্যয় পথ যদি অপরে সহজ করিয়া, সমান করিয়া না দেয়—তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব—এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতেব কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব! এ সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারো কি অভিমান মনে আসে—মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারো কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে! আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে সুরু করিয়াছি! আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না, তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ্‌ এক রাত্রির অতিথির মত আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার নিবৃত্তি হইল না। যে বাঘ একবার মনুষ্যমাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেম্‌নি করিয়া বারংবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জালনিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এম্‌নি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন ত কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনা প্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ্-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে, বাটে, গ্রামে, পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সাংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনো আমরা সম্পূর্ণ আপোস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এম্‌নি করিয়াই মরিয়াছে!

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্ব্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত মারী-শত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের

পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্দ্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারো অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্ম্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয়জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কি? এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীব অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিবের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্ট-পরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্ম্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব্ব-অভ্যাস-বশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট, সেখানে মাছের প্রাচুর্য্য নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিঙ্কোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্তদেশের জীবনী শক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনো শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া, প্লেগ্, ওলাউঠা, দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনাশোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে, আমাদের ঘরবাড়িতে নিত্য হইয়া

বসিয়াছে। বিনাশ যে এম্‌নি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি ত কর, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সাম্‌নে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট্ সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি! আমরা যে মরিতেছি! আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনি আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে, সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারো দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনো-মতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—'কি করিব, কেমন করিয়া করিব?' আজ আমরা কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমা-দিগকে সেই দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ষ্টিম্ উচ্চস্বরে বাঁশী বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশী বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড় করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশন্‌টা আজ খুব একটা বড়

ব্যাপার নহে। আমরা তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোট করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত-উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালী মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেম্‌নি ফিরিয়া চাহিলাম, অম্‌নি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে! কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন্‌ ও প্রোটেষ্ট্‌, বয়কট্‌ ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশন্‌ই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম,—পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষাসর্কুলর্‌ আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে! আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি কবিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে ত তাহাকে বড় করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ, আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি, সকল লাঞ্ছনার উপবে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ঐ লইয়া যদি আজ পর্য্যন্ত কেবলি বিরাট্‌ সভার বিরাট্‌ ব্যর্থতায় দেশেব এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্য্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটকে ক্রমাগতই বড় করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহাব কাছে নিতান্ত ছোট হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদেব গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমরা

যাঁহাকে নায়কপদে বরণ করিব তাঁহাকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া-আনিয়া আমাদের কুটীর-প্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিন-যাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত, গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন্ কবে আমাদের কার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন্, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন্ পরিয়া বিচার করুন্, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারো নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা! মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল—সমস্ত স্বার্থসঙ্কোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না,—কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন!

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গল-সাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে লজ্জা দিতেছে।

হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্রসিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ কর। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অদ্য আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণহস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যাঁহারা পিটিশন্ বা প্রোটেষ্ট্, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ীর বাঁধারাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা দেশহিতব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি। ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ঐ আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য নায়কদিগকে দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে

না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তাঁহারা নিশ্চয় তাহাকে সেই দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কি, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্ত্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক্, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক্। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর,—বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল্ অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্বমোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়, তেম্‌নি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিচেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মত কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে—আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয় মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার,—সকল সদ্গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি

আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

সফলতার সদুপায়।

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজরাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাটবাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম্ম, সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়—এবং—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি

ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই একপক্ষের সুবিধা কোনো-মতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্য্যয় আপনিই ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজসাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্পলোকের আছে। বিশেষত লোভ যখন বেশি হয়, তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ—ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্ব্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জ্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ড্স্বার্থ্, শেলি, কীট্স্, টেনিসন্, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপ্‌লিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল, রাস্কিন্, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্লাড্‌ষ্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না,—একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে;

যে সময়ে বীর্য্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভাল করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না; যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই; এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব, ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোন আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদেব মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূব করিতে পারি, সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব—যাহার দ্বাবা তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত হইবেন? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংবেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন যে এমন কথায় মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের নানাজাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে, স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই স্বার্থকে যত বড় নামই দাও না কেন,

না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মই বল—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারতরাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চঅঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কি জবাব আছে?

কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা কি করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে! তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে, তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি পার্লামেণ্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুসি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না—এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বামহাত ডানহাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেম্‌নি একই? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে ডাল নাড়া দিলে যে ফল পড়ে, আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ সম্বন্ধে মিল্‌ কি বলিয়াছেন, স্পেন্সর্‌ কি বলিয়াছেন, সীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার শিকিপয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, এবং আমরা কর্ত্তা নহি! তার্কিক বলিয়া থাকেন—'সে কি কথা! আমরা যে বহুকোটি টাকা

সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর, আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না কেন! আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।' গোরু যে নন্দ-নন্দনকে দুইবেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে দুধের হিসাব তলব না করে! কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

সাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে কর না কেন, ফরাসিরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মৎলব করে, তবে ফরাসি-প্রেসিডেণ্ট্‌কে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশও শোনায় না—তখন ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এই জন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্ম্মণি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল, তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজরাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জর্ম্মণ্‌-রাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যে দিন মোগলসভায়, নবাবের দরবারে ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্তকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য প্রসন্নতার সহিত গায়ে মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মত নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে দুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ

রহিল গোয়াল বাড়ীতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী, তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন—আমরা ত কোনরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। মনে কর, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যায্যস্বত্বও যে দখলিকারের মন যোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে ত একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে—তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্‌রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়সংশোধনের সুন্দর উপায় এমন কথা কেহ বলিবেন না।

কিন্তু আমাদের যে কি ব্যবস্থা, কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি-বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিক্যাল্ কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব্—গবর্মেণ্ট্ যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেকবার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে;

দ্বিতীয়ত যেখানে বজ্রপড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই, আমার পরামর্শ, প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না; তৃতীয়ত বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য; যেখান হইতে বজ্র পড়ে, সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্রদণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্ব্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। "সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়" বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্ত্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক ছুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁৎ ইংরাজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক্, রাগারাগি করা চলে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোট। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল্ রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে—ফরাসি, জর্ম্মান্, রুষ, ইটালিয়ান্, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল—তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল্

ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগ দ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেণ্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক ;—ইংরেজ স্রোতের জলের মত নিয়তই এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও স্বজাতির সঙ্গে—এখানকার ইতিবৃত্তচর্চ্চার ভার জর্ম্মান্‌দের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দীসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেণ্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে—এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোট, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তি জ্ঞানে কর্ত্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই—এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র, তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাঙ্ঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর, তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি মিউনিসিপালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া আমরা ভয়ে-ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য্য হইতেছি, এত কলরবেও মনের মত ফল পাইতেছি না কেন? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে,

আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে, সেখানে যদি যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোট দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কার্জ্জন্‌সাহেব অমন অত্যন্ত সহজকথার মত বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্রের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন? সর্ব্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়-সম্ভাষণের মত শুনাইতেছে! এই, অষ্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহা-দিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল্‌-আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্য্যাপ্ত প্রেমের সঙ্গীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে—তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড় অত্যুক্তিতে যদি কর্ত্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি! আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্ত্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমনস্থলে ইম্পীরিয়াল্‌ বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্‌ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কার্জ্জন্‌সাহেব আমাদের সুখ-দুঃখের সীমানা হইতে বহু ঊর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না, নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতি-লাভ লইয়া এত ছট্‌ফট্‌ করে কেন? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য-সিন্দুরহস্তে লোক আসে এবং এই সাদরব্যবহারে ছাগের একান্ত সঙ্কোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়—একি আশ্চর্য্য, এতবড় মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে সে একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছে

না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্ত্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর! ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালি-ল্যাণ্ডে বিপ্লবনিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণ-প্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া! বড়য়-ছোটয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয়, তখন জমার অঙ্ক এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এম্‌নিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক—এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি, "তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠ, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব্ব কর," তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, "আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্ম্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতন্‌ কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর—স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্তত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও! তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ কথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কি দিতেছি, কে কি করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্ব্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জ্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই;

ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও হাণ্টার বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষিসম্বন্ধে বল, বাণিজ্যসম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতাসত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন-সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্ত্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে, তাহার দায়িত্ব আছে, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই যথার্থ আদান-প্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে টাকা আছে, অন্যপক্ষে শুদ্ধমাত্র চেক্‌বইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক্ ভাঙানো চলে না। ভিক্ষারস্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না—ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, একএকবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল—কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হোক, আর নিঃশব্দেই হোক, গলাধঃ-করণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাটসভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন, তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্ব্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ্ নিজেকে অর্জ্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়! পুরাতন কথা বলিতেছি,—এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব, আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জ্জিত,—এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি

কেহ এমন কথা বলেন যে, এ আবার তুমি কি নূতন কথা তুলিয়া বসিলে, তবেই আমার পক্ষে মুস্কিল—কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়! এমন কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকাররাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে, সেই জানে, যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে; যেম্‌নি আলো-হয়, অম্‌নি মুহূর্ত্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার-রাত্রি—এখন এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণ্যকথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন, তবে তাহাও সকরুণ চিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা, তাহা নহে। আমাদের এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কি দিবেন, কাহাকে দিবেন, তাহার কোন ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চ্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দ্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্ম; আমাদের দেশে দেশে পরমুখাপেক্ষী কর্ম্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্ম;—কোনো বিশেষ আইন রদ্ করিবার জন্ম নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ম নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব, তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গম্ভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্ম যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুইচারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই যে থাকিয়া-থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা আর ত সম্ভব হয়

না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গভর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সঙ্গীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্‌টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গভর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি, সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলি চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলি দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়? ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নিবানো যায় না, সে ত শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল, দাতার পক্ষেও তেম্‌নি অসুবিধা।

কিন্তু যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ

ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও একস্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গভর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্য্যন্ত দিবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমাদের দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কর্ম্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া বড় শক্ত। এই মনে কর, স্বায়ত্ত শাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন্ আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্ত্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে?

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে —কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি,—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই;

এজন্ত গভর্মেণ্টের চাপ্রাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক্ স্বায়ত্ত-শাসন! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই!

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।—তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ—যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গল-সাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত-চিত্তে, নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক্ এবং কর্জ্জন্‌ও বাঁচিয়া থাকুন!

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম্ম দিবে কে? কর্ম্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমা-দিগকে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জ্জীব দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম্ম দিবে, সেই আমাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না,—যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের

স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না, ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্তকাগজের নৌকা বানাইয়া সাতসমুদ্রপারে সাতরাজার ধন মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো-কারো কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকায় বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌ষ্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশন্ নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড় কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায়, তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি—তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হাল্কা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারি করিয়া তোলা কর্ত্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আমাদের

নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টাদিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলার ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্ত্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলি উষ্ণবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে গিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড় হইয়া উঠে। যথার্থভাবে, গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিণামবোধ চলিয়া যায়—ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলি—প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসঙ্গত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধিই হয় —ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্ব্বলতার উপর নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের প্রতিও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই

প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্ব্বলতা, তাহাকে বড় নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে, গর্ব্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম্ম আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী, যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

১৩১১।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে অভিভাষণ।

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্য একথার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। বস্তুতঃ এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড় দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সঙ্কটকালে যখন

ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমীর, যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয় সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অন্ধকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয় ত ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দ্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মত ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ" মানবসমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি "বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন—"বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি, সমস্ত পরিণামেও যিনি—"স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" সেই দেবতা, তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন, একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটি বশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন।

আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্ব্বাসনে গেলে পর, ভরত যেভাবে রাজ্য-রক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়ম জোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কন্‌গ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে এখনো তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন—যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্ম্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঞ্চল্যে কন্‌গ্রেস্‌কে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবন-ধর্ম্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্ব্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কন্‌গ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে

লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জ্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্ব্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনো মতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্য্যে সর্ব্বত্রই বহুতর বিরোধীদলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্য লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। Labour Party, Socialist প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্র সভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ

মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতিব লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্‌গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবল মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশেব আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও,

নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবল মাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মত-সংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ পর্য্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধিনির্ব্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে, কন্‌গ্রেস্‌ ও কন্‌ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক এক দল যদি এক একটি সাম্প্রদায়িক কন্‌গ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কন্‌গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্‌গ্রেস্‌ সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবল মাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কি লাভ হইবে!

এ পর্য্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের

জন্ত দল বাঁধিয়া যখনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনি ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিষটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে শর্ষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই শর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কি উপায়!

বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্ত আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্ত আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরো বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্ব্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনমতেই চলিবে না, কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে—আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারম্বার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে

কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উগ্র বাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড্ কার্জ্জনমূর্ত্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্ত্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশ-মাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্ব্বলতার কারণ যত দিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা যোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক্ হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে।

যদি একথা সত্য হয় যে হিন্দুদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির ত অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মত। আমাদের পুরাণে কলঙ্ক-ভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেণ্ট, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হোক্ অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হোক্, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনওমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের

যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম্মহানি হয় এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হোক্, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে।—এই প্রকাণ্ড কর্ম্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণধর্ম্মের নিয়মে দেশের যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মত উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্য্যকারণ-পরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দ্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে।

এই ত আমাদের নূতন দল; এ ত আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে, ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, Extremist, বা চরমপন্থী, বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে সকলের চেয়ে বড় এবং মূল Extremist কে? চরমপন্থিত্বের ধর্ম্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিতচঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল—তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ত কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে

লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্ব্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা ত নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তি ক্রিয়া,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে reflex action। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরো একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বৈদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্ব্বল স্নায়ুতেও প্রবলভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড় কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন লর্ড্ কার্জ্জন্, মর্লি, ইবেট্সন্; গুর্খা, প্যুনিটিভ্ পুলিস ও পুলিসরাজকতা; নির্ব্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্ব্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনো

আমাদের যায় নাই—এবং জীবন-ধর্ম্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্ত্তমান এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন্ কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ নিশ্চিন্তরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্ব্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্ত্তন করা সহজ, সম্বরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্য্যে পুলিশের সামান্য পাহারাওয়ালা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেণ্ট ত একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা ত রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রবীণ সারথীর প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনো যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালে পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনি এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওয়ালার যষ্টি যে কোন্ ভালমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না; তখন প্রজাদের মধ্যে যে

বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দ্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেণ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন ;—তখন লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জ্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সম্বরণ করাকেও ত্রুটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্ব্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্ব্বদা ঠিকমত সম্বরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্ব্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে!

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। Extremist নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালোকালীর দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন্ কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতিক ও কর্ত্তৃজাতির মর্জ্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে Extremist দল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো

আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম্ম জিনিষটা কেবল স্বার্থপর ধর্ম্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্ম্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন্ ঘটা'তে পারিলেই হিন্দুধর্ম্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন Extremism বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ, দুষ্টের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিষ নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে, এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং

পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেই জন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরো অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড্ কার্জ্জন্ যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী কখন্ যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনায় বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূর্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায়

দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এযে শক্তি! এযে সম্পদ্! ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জ্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা ত কোনোদিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখসহার দলিল হইয়া থাকিবে;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। কত দিন হইতে

জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ, কথাটা সত্য বটে! অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপাসু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিল! আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না, উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের একটি কোণে একটু শিখার মত দেখা দেন তখনি ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্ব্বে দেশের বড় প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অম্‌নি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্ব্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব—সে কেবল দুটি একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড় কারখানা স্থাপন করিব বাঙালীর এমন না ছিল

শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালী একটা বড় মিল্ খুলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়াই চালাইতেছে এবং আরো এইরূপ অনেকগুলি ছোট বড় উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। ষ্টীম্ নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এই বেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত—এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে সে রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দ্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না

বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কি যে করিব তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মত আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনাব বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কি করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই; তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্ম্মভ্রষ্টউদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসঙ্গত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহবা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল্ সেল্ফ্ গভর্মেণ্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে

হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসলভাগের মাম্‌লা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্ন সকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান,—কর্ম্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্য মুক্তিই ভাল না স্বাতন্ত্র্য মুক্তিই শ্রেয় শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্ব্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র—সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্য সত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্ম্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্ম্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারম্বার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার

চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্ত্তমান ভারতশাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিষ্টীরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত?

যাহার হাতে বিরাট্ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্য্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মত দুর্ব্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হোক্ আর দুর্ব্বলই হোক্ যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্ম্মের অন্তরায় একথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনি ভুলি ইহার সত্যতাও তখনি সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে একথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয়ঃ পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেই জন্যই দেখিতে পাই গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে! প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস্ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেণ্টের প্রসাদ-ভোগী পঞ্চায়েৎ যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেণ্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে আমাদের কর্ম্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসঙ্কোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিষ মানৎ করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবী করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লওগে। আমরাও কথার বেলায় বড় বড় করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাৎ দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে জিনিষটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে। সেই জন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই জন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে চড়িলেই প্যুনিটিভ্ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে, মনে তাহাদের ধিক্কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেই জন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালীকেই বাদ দিয়া মর্লে সেটাকে settled fact বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরাজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড় একটা শূন্য তখন ইহার পাল্টাই দিবার জন্য আমরাও উঁহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা ত সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরাজের সুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে হাঁ-কে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমরাও কি সেই ভুলটাই করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা ত কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়—অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্ম্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশীবর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা, লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা ত আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,—তাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে

না সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে তাহা সংযমীর দ্বারা, যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সঙ্কোচ বশত আমি এ কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেই জন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্ব্বলকেই, হয় স্পর্দ্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধিব স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্ম্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ কবিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহাব ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্ম্ম-শক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিৎ গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্‌শ্যাল্‌ কন্‌ফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি কবিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের

এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মাম্‌লা মিটাইয়া দিবে।

জোৎদার ও চাষা রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।"

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে —নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলী অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা

এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গো-পালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভাল মতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্ম্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড় বড় কারখানা যদি সহরের মধ্যে আবর্ত্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রী পুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিষ পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্ম্মের কোনো উদ্যোগ নাই কেবলমাত্র দুর্ব্বলজাতির দাবী এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ সে সভা দেশের রাজকর্ম্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশশাসনও সর্ব্বগ্রহ ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যখন বড় ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদেব যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ কবিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক মত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামেব মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্ব্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্ম্মে যাত্রার

গানে সাহিত্যরস ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্ব্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারো অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পরঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্ম্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মত রহিয়া যায়;—ডিপ্‌থিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্ সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploitation-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে

পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নবীনকালের নির্দ্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ, এগুলি কি আকস্মিক? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল,—রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলি দূরে চলিয়া যাই-তেছি, আমাদিগকে আর একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও

দেশের শক্তিকে আমাদের কর্ম্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত একপ্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিঁকিতে পারিব কেমন করিয়া?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্ব্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্যোগটা ত সহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা?

জগদ্দল পাথর বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ্ পুলিসের বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ্ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালীর সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে একাজ কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনু-

ভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব্ব হইবে বলিয়া আপাততঃ আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্ব্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট্ বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়ৎদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি ত লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্ত্তা, পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ করিয়া এপদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

একথা যেন না মনে করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারী তত্ত্বাবধান কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের কোনো উচ্চ কর্ম্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড় কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্ত্তা, মামলায় জিতিয়া

লাভ কি? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টি কিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্ব্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্র-চিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে!"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারত মন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু-ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্ব্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্ম্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্ব্বলতা সংশোধন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষদের বর্ত্তমান রাজ-নীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস্ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্ম্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্ম্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্ম্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ৎদিগকে পরের

হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস্, কানুন্‌গো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?

অবশেষে, বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমারই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানেনা তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই

নিবেদন করিতেছি—যে, দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলা দেশের প্রভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্স্ যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন—এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নানা ধমনী যোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্‌গ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মর্ম্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্য্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই :—

প্রথম, বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, বূ্যহবদ্ধতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টি কিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয়-কলেবরের সর্ব্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজগণ সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্ব্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্ব্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্ম্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কথনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্ক-সভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনি একই কর্ম্মের দুর্গমপথে একত্র

যাত্রা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে সমস্ত বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয় ত উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান অভিমান তর্ক বিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এই সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্ব্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্ম্মল করিয়াছি, বায়ুকে

নিরাময় করিয়াছি, বিত্থাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্য্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্ত্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

১৩১৪

সদুপায়।

বরিশালের কোনো একস্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতী লবণের চেয়ে শস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতী লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতী কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেকস্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে আমি এই উত্তর দিব যে—বাংলা-দেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ

ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ-প্রকাশ করাটা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কি? সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্ব্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য-দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুতেই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ বাঙালীর প্রতিবেশী

এবং বাঙালী অনেক দিন হইতেই বেহারীগণের সঙ্গে কারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালী-মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলা দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালীও বেহারী উড়িয়া এবং আসামীকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড় নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্ব্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সারভাগ শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালীর বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতী বর্জ্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হোক্ না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের

মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট্ ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনো প্রকারেই হোক্ বয়কট্‌কে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্ম্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ কথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ

লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই—মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই—আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেই জন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে, বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবী করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবার এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্ব্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো একমুহূর্ত্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, "ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপনলোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই

করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উল্টা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানব প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্য্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোন দিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন থামকা আসিয়া দাঁড়াইলে যে অমনি তখনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মা শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য দেশের সাধারণ গণ-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাষ্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি!

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজিপড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা

নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি যাহারা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের নাই;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনি এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় অতএব সকলে যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোন একটি বড় বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে যদি তাহারা বিলাতী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষের আমদানী না করে তবে নির্দ্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্ব্বক বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে

নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইঁহারা বলেন মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইঁহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছুই নাই। দেশের একপক্ষ

প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মত আবদ্ধ করিবে ইহার মত ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনে প্রকার আপোশে অধিকার প্রাপ্তির মূল্য বোঝে না—তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা ত প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতাকে চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্ত্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার

অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধোর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে, হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কি কাপড় পরিবে বা কি নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্ত্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছিনা—আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনি সে বুঝিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনি সে বুঝিবে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটবড় সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারী উড়িয়া অথবা অন্য যে কোনো ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনি সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার

অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মত তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্ব্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের

উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ড-জ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।* এইরূপ ধর্ম্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্ব্বলতা; প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে সয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটু মাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্ম্মের পথ। কিন্তু ধর্ম্মের পথ দুর্গম—দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি। এই

* কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলগাড়িতে 'বোমা' ছুড়িবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লজ্জা-কর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথের সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকার তৃপ্তিতে নহে, অহংকার বিসর্জ্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫